দৈনিক সংবাদ

তারিখ 27 DEC 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

34

প্রাথমিক শিক্ষার তিন বছর

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী ১৯৯৩ সালে সারাদেশে সম্প্রসারণ করা হয়। তারপর থেকেই সরকার দাবি করে আসছেন যে, প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, আসবাবপত্র সরবরাহ, নলকূপ স্থাপন, শৌচাগার নির্মাণ, পাঠক্রম নবায়ন, নতুন শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর কথা তো আছেই। সরকার দাবি করছেন যে, ১৯৯১ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১ কোটি ২৬ লাখ, তা বেড়ে যেয়ে বর্তমান বছরে ১ কোটি ৬৭ লাখে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ গত চার বছরে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৪১ লাখ বেড়েছে।

প্রথমিক শিক্ষার অন্য বড় খবর হলো ঃ বিভাগটি প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে। শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দের অর্ধেকের বেশি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপখাতে ব্যয় করা হচ্ছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের অধীনে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ১৪০০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ ও মেরামতের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ৫ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ, ২ হাজার বিদ্যালয় মেরামত এবং বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ২ হাজার নতুন বিদ্যালয় নির্মাণ করা হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার পর শিক্ষাখাতে সরকারের প্রধান দায়িত্ব হয়ে পড়েছে, যাদের বিদ্যালয়ে যাবার মত বয়স হয়েছে তাদের সবাইকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা এবং তাদের সবাই যেন পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে তার ব্যবস্থা করা। এর জন্য দরকার প্রয়োজনীয় টাকা পয়সা এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনার। প্রথম বিষয়টির হিসাব দেয়া হয় ঘন ঘন। কিন্তু ব্যবস্থাপনার দক্ষতা অর্জনে যে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি তা দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে মাঝে মাঝেই শুনতে পাই। এর জন্য এই দরিদ্র দেশের টাকা-পয়সার অপচয় হচ্ছে এবং শিশু-কিশোররা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার হালহকিকতের একটি চিত্র সম্প্রতি পাওয়া গেছে বগুড়া জেলা থেকে। গত তিন বছর এই জেলায় নাকি ২ লাখ শিশু ভর্তিই হতে পারেনি। হিসেবটা সরকারি সূত্র থেকে এসেছে। প্রধান কারণের মধ্যে আছে পারিবারিক অসচ্ছলতা, বিদ্যালয়ের অভাব, শিক্ষক সংকট, শিক্ষা সামগ্রীর অভাব। 'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচীও নাকি ভর্তি ও উপস্থিতির গড় হার সন্তোষজনকভাবে বাড়াতে পারছে না। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনায় যারা আছেন, তাদের উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত। এভাবে চললে সরার জন্য শিক্ষার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে।

বগুড়ায় গত ৩ বছরে একটিও নতুন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করা হয়নি। এ বছর যে ২ হাজার নতুন বিদ্যালয় নির্মাণ করার কথা, তার একটিও বগুড়া জেলার লোক দেখতে পায়নি। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ১০৫টি শিক্ষকের পদ শূন্য। তিন থানার অনেক বিদ্যালয়ে ২ জন করে শিক্ষক। প্রত্যন্ত অঞ্চলের বেশ কয়েকটি বিদ্যালয় বসে হয় খোলা মাঠে, নয়তো চালাসর্বস্ব বিদ্যালয়ে। ১৪০০ কোটি টাকার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের ছিটেফোঁটাও প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোতে পৌঁছেছে কিনা সন্দেহ। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নের ক্ষেত্রে বগুড়া জেলার প্রতি এরূপ বৈষম্যমূলক আচরণের কোন কারণ আছে বলে আমরা জানি না।

যদি আমরা বগুড়া জেলার পরিস্থিতিকে দৃষ্টান্ত হিসেবে নেই, তবে দেশের প্রাথমিক শিক্ষার দৈন্যদশাই চোখে পড়বে। সকল শিশুর জন্য একদিকে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, অন্যদিকে তাদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। তিন বছরে সরকার এত তোড়জোড়ের পরও সব শিশুর জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করতে পারলেন না। সরকার কি ভুলে বসে আছেন যে, শিক্ষা খাতে প্রাথমিক শিক্ষাই সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব। আমাদের জনশাসন কর্মসূচীর যে অবস্থা তাতে আগামীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন মুখ আসার হার বাড়বে বৈ কমবে না। এখনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঠাঁই নেই, ভবিষ্যতে কি হবে কে জানে।

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার দৈন্যদশার সঙ্গে আরো দুটো বড় সমস্যা আছে। একটা হলো শিক্ষা শেষ না করেই বিদায় নেয়া। পাঁচ বছর শিক্ষা না হলে, কাউকে তো শিক্ষাপ্রাপ্ত বলা যাবে না। আরেকটি হলো একই ক্লাসে দু'বছর তিন বছর থাকা। শিক্ষাদান ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার ফলে এরা বিদ্যালয়ে শুধু যাওয়া আসাই করে এবং ভিড় বাড়ায়। এ দু'টি সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান আছে ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মধ্যে। নতুন শিক্ষাবর্ষে এদিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নজর দেয়া প্রয়োজন।

এক কথায় বলা যেতে পারে, আমাদের বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় গর্ব করার মত কিছুই নেই। প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বাবধান এবং দেশী-বিদেশী টাকা এখন পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাকে পঙ্গুত্ব থেকে রক্ষা করতে পারেনি। নতুন শিক্ষাবর্ষে কর্তাদের নতুন উদ্যমের অপেক্ষায় আমরা থাকলাম।